



গদ্য

গল্প ও প্রবন্ধ



বাংলা-লিখিত গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ : একটি রূপরেখা

নব্য ভারতীয় আর্থভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব। আনুমানিক সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে আমাদের মাতৃভাষার জন্ম। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। এগুলো কবিতার আঙ্গিকে রচিত। চর্যাপদ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলত কাব্যচর্চার ইতিহাস। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সহস্রাব্দিক বছর বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ভাবের আদান-প্রদান করেছে মৌখিক বাংলায়। বাংলা লিখিত গদ্যের উদ্ভব বিলম্বিত হয়েছে বলেই আঠারো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না।

সাহিত্যের বাহন না হলেও প্রাত্যহিক ও সামাজিক প্রয়োজনেই মধ্যযুগের বাংলাদেশে লিখিত গদ্যভাষার প্রাসঙ্গিকতা অনুভূত হয়েছিল। মধ্যযুগে রচিত ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক চিঠিপত্রে এবং দলিল-দস্তাবেজে আদি গদ্যের দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। প্রয়োজনের তাগিদে রচিত বিশৃঙ্খল এই গদ্যভাষার জন্ম মধ্যযুগের সময় পরিসরে হলেও, বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব হয়েছে আধুনিক যুগে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে।

উনিশ শতকে বাংলা লিখিত গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বিদেশিরা। আঠারো শতকের শেষে কয়েকজন ইংরেজ মিশনারি এদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। উইলিয়াম কেরী এবং টমাস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ঐরাই ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ মিশন থেকে বাংলা গদ্যে বাইবেল-এর অনুবাদ এবং ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। এ-সময়ই ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তকের ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। উইলিয়াম কেরী এক্ষেত্রেও পালন করেন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে যে-সব সিভিলিয়ান কর্মচারী এদেশে আসতেন তারা দেশীয় ভাষা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঔপনিবেশিক শাসনকে সুদৃঢ় করার স্বার্থেই ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার আবশ্যিকতা অনুভব করেছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। তাঁরই উদ্যোগে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। অন্যান্য দেশীয়-ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের সর্বাধিক গুরুত্ব অনুভব করেই কলেজটিতে শুরুর পরের বছরই (১৮০১) বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উইলিয়াম কেরী হন বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। তিনি নিজে বাংলা গদ্যে দুটি বই রচনা করলেন এবং দেশীয় শিক্ষক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দিয়েও কিছু পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করালেন।

বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি থেকে মুক্ত করার কৃতিত্ব যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায়-এর (১৭৭৪-১৮৩৩)। উনিশ শতকের নবজাগরণের অগ্রনায়ক ছিলেন তিনি। তাঁর উদ্যোগ ও চর্চায় বাংলা গদ্য ঐ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে প্রাণবন্ত তর্ক বিতর্কের লিখিত গদ্যরূপ বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। এভাবেই বাংলা গদ্য বিকাশধারার পথ খুঁজে পায়। রামমোহন রায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্ত সার (১৮১৫), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ (১৮১৮-১৯)। রামমোহনের সমসাময়িকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন কলিকাতা কমলালয়, নবাবু বিলাস, নববিবি বিলাস গ্রন্থের রচয়িতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)।

আলোচনা বিতর্ক ও মীমাংসা এবং ধর্মতত্ত্বের বাহন হিসেবে বাংলা গদ্যের অমিত সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামমোহন রায়। আর এ গদ্যকে সাহিত্যের বাহনের মর্যাদায় উন্নীত করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। ভাব ও বিষয় অনুসারে বাক্যবিন্যাস এবং ইংরেজি ভাষার আদলে বিভিন্ন বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার করে বাংলা গদ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও তাঁর। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অভিহিত করেছেন বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী অভিধায়। তবে বিদ্যাসাগর সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি প্রধানত অনুবাদক, পাঠ্যগ্রন্থ প্রণেতা এবং শিক্ষা-সমাজ সাহিত্য বিষয়ের প্রবন্ধকার। তাঁর অনূদিত, রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০), দ্রাক্ষি বিলাস (১৮৬৯), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), বিদ্যাসাগর চরিত (১৮৯১), আত্মচরিত (১৮৯২) ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক এবং লেখক হিসেবে পূর্বে আবির্ভূত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এ পর্যায়ের বিশিষ্ট গদ্য রচয়িতা। ‘বিশুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধির’ চর্চাকারী হিসেবে বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমারের অবদান সুচিহ্নিত। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ও যে বাংলা গদ্যের বাহন হতে পারে, সে সম্ভাবনা আবিষ্কারের কৃতিত্বও তাঁর। অক্ষয়কুমার দত্তের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : ভূগোল (১৮৪১), চারুপাঠ (তিনখণ্ড, ১৮৫৩-৫৯), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬), বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির



সম্বন্ধবিচার(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ; ১৮৫১, ১৮৫৩), ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম খণ্ড ১৮৭০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩) আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ (১৮৫০), আত্মতত্ত্ববিদ্যা(১৮৫২), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকৃত আধুনিকতার সূচনা ঘটে বাংলা সাহিত্যে। এ সময় থেকেই বাংলা গদ্য বিপ্লব সাহিত্যের বাহন হয়ে ওঠে। সৃষ্টিশীল গদ্য সাহিত্য রচনার সূত্রপাতও হয় এ সময়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকে সৃষ্টিশীল গদ্য রচয়িতা হিসেবে সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হন প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-৮৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪), মাইকেল মধুসূদন দত্ত(১৮২৪-৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩৯-৭৩)। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বেশ কটি পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করলেও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর কথিকাদর্মী রচনা ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৭৭৯ শকাব্দ) বিশেষ তাৎপর্যে চিহ্নিত। এ গ্রন্থের দুই কাহিনী সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময়কে কোনো কোনো সমালোচক প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনার প্রয়াস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে বাংলা উপন্যাসের লক্ষণ প্রথম সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে লেখা প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল(১৮৫৮) গ্রন্থে। আলালের ঘরে দুলালের গুরুত্ব শুধু উপন্যাসের লক্ষণযুক্ত প্রথম রচনা হিসেবে নয় বরং বাংলা গদ্যের পালাবদলের মাইল ফলক হিসেবেই এর সমধিক গুরুত্ব। প্যারীচাঁদ মিত্র আলালের ঘরের দুলাল-এ ব্যবহার করলেন কলকাতার চলতি বুলি ও আঞ্চলিক উপভাষা। এর মাধ্যমে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে কথ্যবুলি ও আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের অমিত সম্ভাবনা আবিষ্কৃত হল। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে ‘আলালী ভাষা’ তাই এক স্মরণীয় মাইল ফলক। ‘আলালী ভাষা’ আলোচনায় ‘হুতোমী ভাষা’র প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০) রচিত হুতোম প্যাঁচার নকশাও (১৮৬২-৬৪) কলকাতার চলতি বুলিতে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কালীপ্রসন্নের পূর্বে বাংলা গদ্যে সাধু ও চলিত ভাষারীতির ব্যবধান সুচিহ্নিত ছিল না। তাঁর অনূদিত মহাভারতে এবং হুতোম প্যাঁচার নকশায় ক্লাসিক সাধুভাষা ও অপভাষা মিশ্রিত চলিত বুলির ব্যবধানটি মোটা দাগে চিহ্নিত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম দশক বাংলা গদ্যে মৌলিক নাট্যসাহিত্য রচনার কারণেও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। স্মরণীয়, বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব হয়েছিল নাট্যকার পরিচয়ে। তাঁর রচিত কৃষ্ণকুমারী নাটক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক। মধুসূদনের অন্যান্য নাটকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি প্রহসন একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০) ও বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)। তাঁর নাট্যচর্চায় সম্প্রসারিত হল বাংলা গদ্যের সম্ভাবনা। বাংলা গদ্য যে সার্থক নাটকের, বিশেষত গুরুগম্ভীর ট্রাজেডি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পূর্ণ প্রহসনের বাহন হতে পারে, মধুসূদনের নাটক তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পাঠ্যপুস্তক ও তর্ক-বিতর্কের বাহন হিসেবে প্রচলিত যে গদ্য বিদ্যাসাগরের চর্চায় শিল্প মাধ্যমের স্তরে উন্নীত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর (১৮৩৮-৯৪) সাধনায় সে গদ্য শিল্পিত উপন্যাসের ধারক হয়ে উঠল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গদ্যে, যুগপৎভাবে উপন্যাস ও অন্যান্য গদ্যরচনায় বাংলা গদ্যের গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ঐশ্বর্য সুপ্রমাণিত হল। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিম গদ্যচর্চার নতুন যে পথসন্ধান দিলেন, তাকে অনুসরণ করেই সৃষ্টিশীল গদ্যসাহিত্য উত্তরকালে বিকশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ ((১৮৮৪), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ ১৮৮৭, ২য় ভাগ ১৮৯২)।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) এ যুগের একজন বলিষ্ঠ গদ্যলেখক। বিষাদসিন্ধু (১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯১) তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। লেখকের অন্যান্য গদ্যগ্রন্থের নাম উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০), গাজী মিয়া'র বস্তানী (১৮৯৯)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্য সাধনার বিস্তার ও সমৃদ্ধি বিশ শতকে। আর বিশ শতকের প্রথমার্ধকে অভিহিত করা হয় ‘রবীন্দ্রযুগ’ নামে। স্মরণীয়, উনিশ শতকেই রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিশেষত ‘গল্পগুচ্ছের’ শ্রেষ্ঠগল্পগুলোর বেশ কটি রচিত হয় এ-সময়ে। তবে গদ্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের শিখরস্পর্শী সাফল্য ঘটেছে বিশ শতকেই। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির পালাবদল ঘটে। এ সময় থেকে তিনি সাধুভাষা রীতির গদ্য পরিত্যাগ করে চলিত ভাষারীতির গদ্য গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু গদ্যচর্চায় ঐ রীতির প্রয়োগ অব্যাহত রাখেন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যচর্চায় বিকাশমান বাংলা গদ্যভাষা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। মানুষের বহুমুখী আবেগ অনুভূতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন তাঁর সৃজনশীল চর্চায় বাংলা গদ্যের বাহন হয়ে ওঠে। বাংলা গদ্যের যে সম্ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গদ্যে তা বিচিত্রমাত্রিক ব্যঞ্জনায় ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে নিজের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথই ছিলেন বাংলাগদ্যের ‘মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য’। রবীন্দ্রনাথের বিপুল গদ্যসম্ভারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে : নাটক-অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), রক্তকরবী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২৫), উপন্যাস-চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯০৮), চতুরঙ্গ(১৯১৫), ঘরে বাইরে (১৯১৫), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯)। ছোটগল্প-গল্পগুচ্ছে (তিনখণ্ড), সে (১৯৩৭), তিনসঙ্গী (১৯৪১)। প্রবন্ধ-সভ্যতার সংকট (১৯৪১)। সাহিত্য সমালোচনা-প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭)। রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ক গ্রন্থ-স্বদেশ (১৯০৮) শিক্ষা (১৯০৮), কালান্তর (১৯৩৭)। ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক



গ্রন্থ-ধর্ম (১৯০৯), শান্তি নিকেতন (১৯০৯-১৬), মানুষের ধর্ম (১৯১৩)। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-পঞ্চভূত (১৯০৭), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), ছিন্নপত্র (১৯১২), জীবনস্মৃতি (১৯১২) রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), ছেলেবেলা (১৯৪০)।

রবীন্দ্র-যুগে আবির্ভূত হয়েও যিনি রবীন্দ্রগদ্য দ্বারা প্রভাবিত হননি এবং রবীন্দ্রনাথকেই প্রভাবিত করেছিলেন, তিনি প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। তাঁর লেখক ছদ্মনাম ‘বীরবল’। নতুন গদ্যরীতির প্রবক্তা হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গদ্য ‘বীরবলী গদ্য’ নামে পরিচিত। তাঁর আর এক অসামান্য কীর্তি সবুজপত্র নামের সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনা। তিনিই প্রথম কলকাতার প্রমিত চলিত ভাষায় গদ্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর সম্পাদিত সবুজপত্র পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম চলিত ভাষারীতির গদ্য লেখা শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-বীরবলের হালখাতা, নানা কথা (১৯১৯), রায়তের কথা, গল্পসংগ্রহ।

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় বাংলা গদ্য উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে পৌঁছালেও কোটি কোটি বাঙালির জীবন্ত ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা আজও বিকাশমান। রবীন্দ্রযুগে এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা গদ্যচর্চায় যাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন, সেসব সৃষ্টিশীল কথাসাহিত্যিক ও মননশীল প্রাবন্ধিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম ও কৃতিত্বের পরিচয় নিচের ছকে উপস্থাপন করা হল :

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম
১. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)	প্রকৃতি(১৩০৩), জিজ্ঞাসা (১৩১০), বিচিত্র জগৎ (১৯২০)।
২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)	বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (১৯৪৯), ঘরোয়া (১৩৪৮)।
৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮)	পল্লীসমাজ (১৯১৪), শ্রীকান্ত (১৯১৭-৩৩), চরিত্রহীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০)।
৪. রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)	গড্ডালিকা (১৯২৪), কজ্জলী (১৯২৭)।
৫. মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)	আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কবি শ্রীমধুসূদন, বঙ্কিম-বরণ।
৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)	পথের পাঁচালী (১৯২৯), আরণ্যক (১৩৪৫), ইছামতী (১৩৫৬)।
৭. কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)	শাস্ত্র বঙ্গ (১৩৫৮), কবিগুরু গ্যেটে (২ খণ্ড), বাংলার জাগরণ (১৯৫৬), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম (১৯৬৬)।
৮. আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)	আয়না, ফুড কনফারেন্স, আসমানী পর্দা, গালিভারের সফরনামা, জীবন ক্ষুধা, আবেহায়াত, সত্যমিথ্যা, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর এবং আত্মকথা।
৯. তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)	গণদেবতা (১৯৪২), পঞ্চাখ্যাম (১৯৪৩), কবি (১৯৪২), হাঁসুলী বাকের উপকথা (১৯৪৭)।
১০. কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)	বাধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), ব্যথার দান (১৯২২), যুগবানী (১৯২২), দুর্দিনের যাত্রী।
১১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৫৭)	স্বগত, কুলায় ও কালপুরুষ।
১২. মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬)	সংস্কৃতি-কথা (১৩৬৫)।
১৩. সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-৭৪)	দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, শবনম।
১৪. আবুল ফজল (১৯০৫-১৯৮১)	রাঙা প্রভাত (১৯২৭), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬০), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, শুভবুদ্ধি, সমকালীন চিন্তা।
১৫. হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)	বাংলার কাব্য (১৯৪২)।
১৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬)	পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), চিহ্ন (১৯৪৭)।
১৭. বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)	কবি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য, মহাভারতের কথা, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, আমার যৌবন, আমার ছেলেবেলা।
১৮. বিনয় ঘোষ (১৯১৭-৮০)	বাংলার নবজাগৃতি, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।
১৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১)	নয়নচারা, লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো।
২০. মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১)	কবর, মীরমানস, বাংলা গদ্যরীতি, তুলনামূলক সমালোচনা।